প্রথম প্রকাশ ঃ
১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ
রুদ্রেন্দু সরকার
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

সহযোগিতায় ঃ
ইউ, বি, আই

মুদ্রক ঃ
ফিনিক্স প্রিন্টার্স
২. চোরবাগান লেন.
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ ঃ
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ভূমিকা

ভারতের নবযুগ যাঁরা প্রবর্তন করেছেন, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে জওহরলালের স্থান প্রথম শ্রেণীতে—ইতিহাসে তাঁর কীর্তি অমর ভাষায় লেখা থাকবে।

যাঁরা তাঁর সাহচর্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন- তাঁরা সকলেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নানা গুণে মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন।

'বাপু'র কাছে তিনি অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন—কর্ণধার সেইটিকে ধ্রুবতারা ভেবে ভারত-তরীকে চালিয়েছিলেন বিপদ-সঙ্কুল রাজনৈতিক সমুদ্রের মধ্যে।

নেহেরুর অহিংসা-নীতির উপর আর আমরা আগেকার মত ভরসা রাখতে পারছি না।

তবে তাঁর দেশপ্রেম, জনসাধারণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ভারতের কৃষ্টি ও আদর্শের উপর তার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও সর্বোপরি স্বাভাবিক উদার্য ও শালীনতা—ভারতের সর্বসাধারণকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

তাঁর সমকক্ষ মহামানব এ যুগে সারা বিশ্ব খুঁজলে বেশি মিলবে না।

বাংলার কবিরা তাঁর প্রতি যে 'অনির্বাণ' শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন—তা আমাদের সকলের, মনের কথাকে ভাষা দিয়েছে।

তরুণ কবিগোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি বাংলাভাষী সকলের কাছে পুস্তিকাটির যথেষ্ট আদর ও প্রসার হবে।

প্রফুল্ল ঘোষ



সূচী ঃ

প্রতিবেদন

······একটি নাম—যা পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রতিটি ধূলিকণার সাথে পরিচিত। পৃথিবীতে এমন দেশ বোধহয় খুব কমই আছে যেখানে তাঁর পদরেণুর ছোঁয়া পড়েনি। যে পুরুষ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে একটি সুবৃহৎ ঐতিহ্যপূর্ণ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সে পুরুষ ছিলেন কবি। তিনি হাসতেন, গল্প করতেন, লিখতেনও কতো কি; সময়ের সীমা তাঁর নাগাল পায়নি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তাঁকে জানতো, বুঝতো, আবার সমালোচনাও করতো। মানুষ যখন বাঁচে, বাঁচার লক্ষণই সমালোচনা! কোন মানুষই পরিপূর্ণ নয়।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন বহুদিনের, তাই তাঁর স্তুতি-নিন্দার ঢিবি এখন পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে এ পাহাড় দেখা যায়। এ পাহাড়ে ফুলের বাগান যখন আছে তখন কাঁটার বনও থাকবে নিশ্চয়ই।

শান্তির পায়রা উড়িয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর কল্পনার শান্তিরাজ্য, এক নিখিল গড়বার জন্যে সতেরো বছর ছোটাছুটি করেছেন। খুইয়েছেনও কতো কি। হয়তো তাঁর সব কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। লাল গোলাপের কুঁড়ি ফোটার আগেই হয়তো ঝরে পড়েছে। তাই বলে কি প্রেমিকের প্রেম ব্যর্থ হবে······

একদিন হয়তো পৃথিবীতে শান্তি নামবে। কোটি শিশু হাই তুলে চোখ রগড়ে একগাল হাসি ছিটিয়ে সার দিয়ে এসে দাঁড়াবে; কার সামনে! একটি রক্ত গোলাপ আর এক অনির্বাণ শিখা অন্তরীক্ষে হাত তুলে অভয়

জানাবে,…আমি আছি, আমি থাকবো…খেতে…খামারে শিল্পের মন্দিরে…

শুধু স্তব স্তুতি করতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা ফরমায়েস ছিলো না। দুর্ভাগ্যের বিষয় তবুও কয়েকজন কবির কাছে আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের রচনা সংকলনভুক্ত করার সৌভাগ্য হয়ে উঠলো না। প্রত্যেকের অন্তরের কথা জানবার অদম্য ইচ্ছা জেগেছিলো। রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে যে পুরুষ লুকিয়েছিলেন সেই লুকোনো অবয়ব কার চোখে কেমন ভাবে ধরা দিয়েছে জানবার বাসনাতেই এই সংকলন।

শিল্প ও সংস্কৃতির পূজারী বাঙলা দেশের প্রায় সব কবিই সংকলনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এগিয়ে এসেছেন নিঃস্বার্থভাবে।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় সত্যেন বোস সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় চিরঋণী করে রেখেছেন।

যাঁদের দানে আমার এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো তাঁদের সবাইকে জানাই আমার শ্রদ্ধা। আর যাঁরা নামের আড়ালে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের ও বন্ধুপ্রতিম কবি মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল হাজরার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

স্বল্প সময়ের গণ্ডীতে এ সংকলন প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থনায় কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে গেল। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আশা করি পাঠকেরা মার্জনা করবেন।

রুদ্রেন্দ্রু সরকার

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জহরলাল

শিক্ষা, দীক্ষা, পাশ্চাত্যের, ভারতের দেওয়া মন—
ক্ষমা তিতিক্ষা তবো সংযমে তুমি খাঁটি ব্রাহ্মণ।
কমল কোমল হৃদয় তোমার সদাই নয়নে জল—
তাপসের মত কঠিন কঠোর—বিপদে অচঞ্চল।
তুমি ভারতের কুমার কিশোর শ্রেষ্ঠ সুসন্তান—
তুমি অনন্তকীর্তি তোমাব জ্যোতি যে অনির্ব্বাণ।
নূতন যুগের অর্জ্জুন তুমি আমাদের ফাল্গুনী
যতরূপ তত ভাবৈশ্বর্য্য তেমনি ও জ্ঞানী গুণী।
মহাভারতের মৃত্তিকা সাথে তব অনন্ত যোগ
মৃত নহ তুমি অমৃতময় জীবন করিবে ভোগ।

কালিদাস রায়

মহারথ নেহরু

মহাকাব্যের চরিত্র তুমি মহাকবি ছাড়া ভবে
বর্ণিতে তব বিরাট চরিত্র কাহার স্পর্ধা হবে ?
মোর অক্ষম লেখনীটি নাহি সরে
নয়নে অশ্রু ঝরে ।
যা বলিব ভাবি বলিতে ভুলিয়া যাই
ভারতের শোকসাগরে পাই না থাই ।

ভারতবর্ষে অর্ধশতক বর্ষের ইতিহাসে
আর কাহারেও হেরি না তোমার পাশে
যার পানে চেয়ে চেয়ে
অস্থির মতি স্বস্তি লভিবে সান্ত্বনা বাণী পেয়ে ।

জানি জানি দেব তুমি তো অমর নহ,
তাই বলি এই বেদনা দুর্বিষহ,
কেমনে ভুলিব বলিলে না মহারথ,
তাইতো কাঁদায় নয়ন ধাঁধায় ভারত-ভবিষ্যৎ ।
এখনো যে তার ঘুচেনিক দুর্দিন
এখনো ভারত নিয়তির পরাধীন
ভ্রূকুটি হানিছে লাল চোখে লাল-চীন

তপে অর্জিত দুর্জয় গুরুভার
তব গুরুদেব সঁপিলেন তোমা, তাঁহারে নমস্কার ।

এই সেই স্বাধীনতা
অর্জনে তার সহিলে যতেক ব্যথা
রক্ষণে তার ঢের বেশি ক্লেশ বরণ করিলে তুমি
সারা এ বিশ্বে মহামহীয়সী হইল ভারতভূমি ।

কত সঙ্কট কত সমস্যা করিয়াছে অভিযান,
বিঘ্ন ব্যাঘাত দল বেঁধে এলো কে করিল তারে ত্রাণ ?
কাহার প্রখর মনীষা শৌর্য সর্বংসহা নীতি
দূরিল সকল চক্রান্তের ভীতি ?
বিশ্বজিতের দাতা
নিষ্পেষিত নিঃসম্বল নিঃস্বগনের ত্রাতা
আপনারে তুমি নিঃশেষে দেশে করিয়া গিয়াছ দান
যুগ-যুগান্ত ব্যাপী সে দানের কেবা করে পরিমাণ ।
প্রয়াগ তীর্থে শীলাদিত্যের মতো
সব বিতরিয়া দীনবেশে তুমি বুদ্ধ চরণে নত ।
তাঁরি মতো রাজধর্ম পালন কয়িয়াছ অবিরাম ।
ক্লান্ত আত্মা চাহিল তোমার সুপ্তির বিশ্রাম ।
ঘুমাও ঘুমাও তুমি
ললাটে তোমার বুলাইছে পানি জননী ভারতভূমি

জীবনের ব্রত উদ্‌যাপি বীর গেলে তুমি আজ চলি
সারা দেশে শোকে উৎকণ্ঠার অনল উঠিল জ্বলি,
ধূম কুণ্ডলী ব্যাপ্ত তাহার সারা এ
এসিয়া জুড়ে
সে অনলে তব নশ্বর তনু পুড়ে ।
সহসা গিরীশ শৃঙ্গে তোমার ভাস্বর তনু হেরি ।
মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী ঘোষিতেছে তব
বরাভয় ভেরী ।

নরেন্দ্র দেব

জহরলাল

জীবনে তিনি কাউকে কষ্ট দিয়েছিলেন কিনা জানিনা
কিন্তু দূর করতে চেয়েছিলেন সকলেরই দুঃখ কষ্ট।
দুষ্টের দমন করতে পেরেছিলেন তিনি একথা মানিনা।
তার প্রৌঢ় বয়সেও যৌবনোদ্ধত দেখেছি তাঁকে স্পষ্ট ॥

জনগণের বিশ্বাস যথাসাধ্য পেয়ে চলেছিলেন তিনি,
ভারতবাসীদের ভালোবাসতেন ঠিক ভাইয়ের মতোই
অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও হিংসায় ভীত হতেন না যিনি.
মুসলমানকে আত্মীয় বোধে ক্ষমা করতেন, অপরাধ করুক তারা যতই

অপরাধীকে ক্ষমা করলেও অপরাধকে চেয়েছেন দমন করতে ;
সমাজ-তান্ত্রিক শাসনের তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী,
লজ্জিত হতেন না বহু সম্মান ও সমাদরের মকুট পরতে।
তাঁকে ভয় করতো মনে মনে যাদের মনটা ছিল অন্যায় দাগী।

তাঁর চরিত্রে কখনো গৌরবের বিকার ঘটতে দেখা যায়নি ;
তিনি হাসতেন, গল্প করতেন, বই পড়তেন লিখতেনও কতো কি ;
ভাষণ দিতেন সমাহিত চিত্তে, সময়ের সীমা তাঁর নাগাল পায়নি !
সকলের শ্রদ্ধা ও প্রেমের পূজা পেয়েছে আর কেউ তাঁর মতো কী ?

একটু বেশি ভাবতেন তিনি কোনও কাজে হাত দেবার আগে,
নিঃশেষে কিছু মিটিয়ে ফেলার দুঃসাহস ছিল না তাঁর
দুকুল রেখে চলার চেষ্টাই সব ব্যাপারে তাঁর মনে জাগে।
প্রীতির প্রভাবে চেয়েছিলেন তিনি সকল অপ্রীতির সমাহার ॥

মানুষের প্রতি প্রেম আর প্রেমের প্রতি বিশ্বাস—
এ ছিল তাঁর হৃদয়ের দেবোপম দুর্বলতা,
বিশ্বের মৈত্রীলাভে চেয়েছিলেন ফেলতে সহজ নিঃশ্বাস
জহরলালের মনে ছিল গাঁথা এক শৈশবের রূপকথা ॥

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাঙা গোলাপ মালা

ফুলের মালায় সাজিয়ে ডালা দাঁড়িয়ে ছিলাম
বাহির আঙিনায়
থম-থমে সেই দুপুর বেলায় ঃ
ভাবছি এবার যাই ফিরে যাই, মালার কুসুম
ছড়িয়ে দিয়ে যাই।
সে-ই যদি আজ হারিয়ে গেল,—কোনো সান্ত্বনাই
আনবে নাকো অন্ধকারে আলো-করা অনন্ত বিশ্বাস।
হঠাৎ যেন কিসের আভাস
সরিয়ে দিল গুমোট হাওয়ার তপ্ত হাহাকার,
ঘুচিয়ে দি সকল বাধা ; সকল বন্ধদ্বার
এক নিমেষে খুলে গেল। ডাক দিল কে—
"এস এস ঘরে।"

বিশ্বচরাচরে
সেই ডাকে আজ লক্ষ কোটি মালার ফুলে ফুলে
হৃদয়-সাগর উথলে-পড়া বিদায়-ব্যথা উঠেছে দুলে দুলে

আমার হাতে ছিল মালা, রাঙা-গোলাপ-মালা,
তোমার প্রিয় প্রতিদিনের আধ-ফোটা ফুল গন্ধমধু ঢালা
তাই দিয়ে যে গেঁথেছিলাম অনেক আশা ক'রে
চোখের জলে ভিজিয়ে মালা বিছিয়ে দিলাম
তোমার বুকের পরে।
তোমার মুখে ফুটল হাসি, চিরকালের সেই যে চেনা হাসি,
ফুলের ব্যথা জুড়িয়ে দেওয়া, তাইতো ভালবাসি,
ভালবাসি তোমায় প্রিয়, যেমন বাসে চন্দ্রসূর্যতারা
হারিয়ে গিয়েও নয়কো তোমা-হারা
এই পৃথিবী ; জন্ম জন্মান্তরে
ভাঙলে খেলা সন্ধ্যেবেলা মায়ের আঁচল ধ'রে
ফিরবে তুমি চিরদিনের চেনা আপন ঘরে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্যোতিষ্ক সত্তা

কালপুরুষের ধনু
নিদাঘের অভিশপ্ত রাত্রিশেষে কোনো
অকস্মাৎ দিল কি টঙ্কার ?
ক্ষীণবৃন্ত নক্ষত্রেরা ঝরে গেল আতঙ্ক-পাণ্ডুর !
বিহ্বল প্রভাব এল শোকাহত আরক্ত নয়ন ।
অলীক কল্পনা জানি !
অরণ্যে ও সমুদ্রে পর্বতে
পৃথিবীর হাটে মাঠে ঘাটে
জীবনের স্রোত নিত্য বয়ে যাবে ছেদহীন বেগে,
স্তব্ধ কোনো মুহূর্তও
কোনখানে হবে না নিথর ।
সৃষ্টির প্রবাহ বুঝি চির-উদাসীন
জন্ম মৃত্যু-ডোর হ'তে খসে গিয়ে তবু,
একটি জ্যোতিষ্ক-সত্তা
মানুষের ইতিহাসে
রেখে দিয়ে গেল না কি
সূর্যাংশের শাশ্বত স্বাক্ষর ।
স্বাক্ষর, না অবিনাশী সঙ্কল্পের বীজ ।
যেখানে প্রাচীর তোলা
দেশে দেশে মানুষে মানুযে,
শক্তির সংগ্রাম যেথা
লোভে, দম্ভে, হিংসায় নির্মম
শঠতা ও কৌটিল্যের শ্লাঘামত্ত
কণ্টকিত রক্তাক্ত প্রান্তরে
সেইখানে অঙ্কুরিত সে-বীজের সত্যমূল প্রীতির পাদপ
দূর করে' সব ভেদাভেদ
অগণন প্রসারিত পত্রপুষ্প পুঞ্জিত শাখায়
একদিন সারা বিশ্ব ছেয়ে
বিছাইবে সুবাসিত ছায়া ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জওহরলালের গোলাপ

নিত্য দেখি তবু থাকি তৃষিত নয়নে।
প্রত্যহের প্রথম সাক্ষাৎ তুমি, রঙিন গোলাপ
প্রত্যহ অপরাজেয় প্রত্যহ অমর
যেন কোন সুনিপুণ গুণীর আলাপ
কণ্টক কঙ্কালে স্থির কষ্টের আসনে
ঋজু নিষ্ঠ। তুমি বুঝি রক্তাক্ত মাটির প্রত্যুত্তর
কঠিনের রোমাঞ্চে রক্তিম। আপনার দানে তুমি দানী,
অতীতের স্বপ্নমাখা প্রাণে প্রাণে তুমি এক বিস্তীর্ণ আগামী।
কত ক্লেশ ক্ষয় ক্ষোভ দ্রোহ-দ্বন্দ্ব আঘাত-হনন
পার হয়ে এই এক উল্লসিত দীপ্ত জাগরণ—
বিনিদ্রিতা কুণ্ডলী শক্তির। এই এক ফেনায়িত তীক্ষ্ণ ঊর্দ্ধগতি
ব্যথার প্রদীপ-জ্বালা চিরন্তন আনন্দ-আরতি।
সত্তার গহন হতে ডেকে আনো গভীরের রসের উৎসার,
শোনা যায় বৃন্তে-দলে কবে কার শৃঙ্খলে ঝঙ্কার।
তাইতো তোমারে যত্নে গেঁথে রাখি বুকের নিভৃত কাছাকাছি
যতদিন তুমি আছ পৃথিবীতে আমি রব বাঁচি
দুর্গম চূড়ায় তুমি দুঃসাধ্যের সাধ
প্রথমে প্রয়াস, শেষে প্রপূর্ণ প্রসাদ ॥

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লাল গোলাপ

হিমানীর শ্বেত হাসি কঙ্কাল হাসির মতো
চাপা দিয়ে রক্ত আর মৃতদেহ কত
ধু-ধু করে।
বোবা এক হাহাকারে
কোটি-কোটি হৃদয়কে নাড়া দেয় গ্রামে ও শহরে।

তবু জানি এই মাটি এই আলো এই যে আকাশ
ভাঙবার নয়
তোমার শপথে তার ঘটেছে প্রত্যয়।
রাহুমুক্ত সময়ের সঙ্কেত নিশানা
ঘুমে আর জাগরণে দিয়ে যায় হানা
সীমানা, জীবন-সীমানা।

একদিন গলবে বরফ আনবে জোয়ার
গোলাপ ফুলের
প্লাবন ছাপিয়ে যাবে হৃদয় কুলের।

সেখানেতে কোনো বোমা ফাটবে না
কোনো তরোয়াল লাল ফুল কাটবে না॥

মনীষ ঘটক

হায় বেদুইন

ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার শোন,
মরু দিগন্তে নেই সীমান্ত কোনো।
এই ওয়েসিস্! ওই ধূ ধূ প্রান্তর,
আজ বর্ষণ, কাল আগুনের ঝড়।
শুক্‌নো ফসল খ্যাড়াও খেজুর ডালের
ক'দিন মেটাবে খিদে এ পঙ্গপালের!
তাই চেয়েছিলে তপ্ত বালুর পারে
পৌঁছুতে কোনো শস্য শ্যামল দেশে
দুঃখ দৈন্য কানুন আদ্যিকেলে
যেখানে করাল কালো ছায়া নাহি ফেলে,
প্রেমের দেবতা যেখানে মধুর হেসে
নির্মল করে মলিন মর্ম কাড়ে।
বেদুইন সেই স্বপ্নপুরের চাবি
কারে দিয়ে গেলে, ছল ছল চোখে ভাবি॥

বনফুল

জয়—জয়—জয়

মৃত্যুহীনের কাছে সসঙ্কোচে আসিল মরণ,
সসম্ভ্রমে নিবেদিল, হয়েছে সময়—
তারপর লক্ষ কণ্ঠে, জয়, জয় নেহরুর জয়।
সে বিরাট জয়ধ্বনি প্রসারিত হল বিশ্বময়
সে বিরাট বর্ণঘটা আকাশের জাগল বিস্ময়
জয়, জয়, জয়, জয়, নেহরুর জয়।
কবি, নেতা, হে বীর নির্ভয়
না, না, কোন কথা নয়—
জয় জয় শুধু জয় জয়
যুগ হ'তে যুগান্তরে হউক অক্ষয়
জয় জয় শুধু জয় জয়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কাশ্মীরইন্দিবর নেহরু-স্মরণে

চাইনি তো নীহারিকা—আকাশ-গঙ্গার ছায়াপথ
নেহারি ত্রিনেত্রে তাই, ইন্দিবর, কী নির্মাণ করে গেছ দূর ভবিষ্যৎ-
মুক্তির উদার ক্ষেত্র—সুতমিত রমণী সমাজ।

কী ভাগে রজনী ভোর আজ—
চন্দ্রভাগা তীরে তবু আছে জম্বুদ্বীপ
হাজার হাজার বছরের আলো--নীলনহরের সিন্দুটিপ।

হুমায়ুন কবির

জওহরলাল নেহরু

প্রথম শৈশবে তুমি এদেশের বেসেছিলে ভালো।
আকাশের দীপ্তনীল, বৈশাখের অফুরন্ত আলো
গঙ্গা যমুনার ধারা, হিমাদ্রির উত্তুঙ্গ শিখর,
বনানীর ঘনছায়া, দূরব্যাপি বিরাট প্রান্তর
বেজেছে তোমার প্রাণে ঝংকারিত প্রতিধ্বনি তুলি।
ভারতের জনতারে প্রাণ দিয়ে বেসেছিলে ভালো,
সেই প্রেম চিত্তে তব অনির্বাণ যে দীপ জ্বালালো,
তারি দীপ্ত চিরদিন জীবনেরে করেছে উজ্জ্বল।
দৈনন্দিন জীবনের যত দুঃখ যত অমঙ্গল
অতিক্রম করি তাই দেখিয়াছ আত্মা অনির্বাণ।
দারিদ্র্য পীড়িত গৃহে রোগশোক অনাহার ভুলি
গ্রামবাসী কিষাণের অমৃতের লাগি যে সংগ্রাম,
করেছে তোমারে মুগ্ধ, তুমি তারে করেছ প্রণাম।
মৃত্যুঞ্জয় আজি তুমি, কণ্ঠে তব বিজয়ের গান।

বন্দে আলী মিয়া

নরোত্তম নেহরু

পুরুষ সিংহ ওহে লহো নমস্কার
তোমারে হেরেছি আর জানায়েছি শ্রদ্ধা বার বার।
কোটি কোটি মানবের জয় করি হৃদয় আসন
বাঁধিয়া প্রীতির ডোরে স্নেহ দিয়া করেছো শাসন।
বাপুজীর প্রতিনিধি—সেবার সাধনা মনে তার
কারার প্রাচীর মাঝে পেয়েছিলো প্রেম বসুধার—
ভারতের বীর পুত্র—চিত্তে তার ত্যাগ আর ক্ষমা
তাহার পরশে দেশ হলো মুক্ত চির মনোরমা।

লৌহমানব এবে লহো নমস্কার
ধরার ধূলির মাঝে ফিরে তুমি আসিও আবার।
সারাটি জীবনে কভু অবসর পাওনিকো হায়
তাই বুঝি সহসা গো অসময়ে লয়েছো বিদায়!
আর্তমানব ডাকে—ডাকে তোমা নিখিল ভুবন
কোটি কণ্ঠে ডাকে দেব—সাড়া দাও—মেলগো নয়ন
নরোত্তম হে নেহরু—রেখে গেছ অমৃত প্রসাদ—
শুদ্ধ হোক দেশবাসী—ভুলে যাক্ হিংসা বিবাদ।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

নক্ষত্রের নাম

দুঃখেরই আরেক নাম সুখ বলি তারে—
সেই সুখ আর দুঃখ লয়ে
মানুষের মেলা বসে পৃথিবীর কিনারে কিনারে ;
সে মানুষই মৃত্যুজয়ী সব দুঃখ জয়ে ।

সে এক অমৃত লোক—
অবিরাম সংগ্রামের শেষে
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ;
স্থিরলক্ষ্য অন্ধকারে
জওহর উজ্জ্বলতম
নক্ষত্রের নাম ।

দিনেশ দাস

মহাপ্রহরী

রক্তের স্নানে জাগল ভারতবর্ষ
খণ্ডিত তবু—অখণ্ড প্রাণভূমি :
মৌচাকে তার জমল শান্তি-মধু—
অশথ পাতায় শান্তির মৌসুমী।

আজো কি প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে মহাপ্রহরী জাগে ?
নিষুতি রাতেও শুনি উদাত্ত স্বর,
তার চোখে কেউ নামতে দেখেনি রাত—
অশান্ত দেশ দেয়নিকো তাঁকে এতটুকু অবসর :

নেই নেই সন্দেহ,
এই দ্বীপময় ভারতবর্ষ সেই পুরুষেরই দেহ :
এশিয়া-পুরুষ বিশ্বপুরুষ তিনি
নেহেরুকে চেনো ?   চিনি !

শুনি তার স্বর :
'কে আনে এখানে বিনামেঘে কালোঝড় ?
হে বন্ধু তুমি ভারত-সাগর ওপারে নোঙর ফেলো
হে প্রিয় বন্ধু, হিন্দুকুশের আড়ালে আগুন জ্বেলো
হে সুহৃৎ, থেকো দুরন্তে তিব্বতে,
গিরিপথে, বনপথে :
হবে কি সমন্বয় ?
এদেশ গানের—মেসিনগানের নয়।

তবু সে যখনই ছড়াবে আমার শান্ত আকাশে
সমরের মহামারী,
তখনই আমার চল্লিশ কোটি ছেলেমেয়ে সারি সারি

আকাশে তুলবে মাথা—
নদী মাঠ জুড়ে অরণ্য হবে গাঁথা,
ভারত-সাগর বাষ্পেতে হবে নীল
জটিল দিগ্‌বলয়—
নিজের বজ্রে চমকাবে হিমালয়
আশ্চর্য! অম্বুদ!
আরব সাগরে টগবগে লাল রক্তের বুদ্বুদ।'

সব কথা তার হয়নি উচ্চারিত,—
শব্দের ঝড় মানেনি তো বন্ধনী।
ভারতের হৃদে সমতলে আমি শুনেছি প্রতিধ্বনি :
শব্দের সুরধনী,
আমার দেহের ছোট ছোট নীল নদী-উপনদী
ধমনী শিরায় শুনি॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লাল গোলাপের জন্য

আমারও প্রিয় রং লাল,
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয়নি ;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হইনি ;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মত এখনও সরে আসেনি।

চষা মাটির মতো এবড়ো-খেবড়ো সময়,
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ ;

আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে
চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ-
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ

লাল গোলাপের জন্য
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের' লড়াই ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

তর্পণ

না না হাহাকার নয়,
শুধু জনমনের জোয়ারে
স্নান ক'রে ঘরে ফেরা,
শুদ্ধ হওয়া
—এই বারে বারে।

আকাশ অতন্দ্র ব্যাপ্তি,
গোলাপ গভীর কী যে রূপ।
আরো এক কথা আছে—
সে মহামৃত্যুর এই চুপ।

মিছিল কি জানে তাকে?
প্রবৃত্তি মানে কি তাকে?
তাই—
ক্ষুব্ধ পৃথিবীও বলে
এসো শেষ বিশ্বাস নেভাই।

তারপরে অন্ধকারে—
দেখি মহাশূন্যের রাত্রিতে
হীরের গোলাপ হয়ে ছড়ায় সে যাত্রীতে-যাত্রীতে
মিছিল এগিয়ে যায়,— প্রহর চলেছে অবিরত।
হীরের নির্যাস হয়ে নক্ষত্রেরা থাকেই শাশ্বত।

না না হাহাকার নয়
এ আবার আকাশ-দর্শন।
শুধুই বিষাদ নয়, নয় শুধু শোকাশ্রু-বর্ষণ।

সুশীল রায়
পথিকৃৎ

সময় চলেছে যদি
নিরবধি—
যদিও কাব্যের মত জীবনেও চাই মিল, চাই ছন্দ যতি,
থমকে দাঁড়াবার জন্যে বিন্দু বিসর্গও নাই মতি।

চলেছে অনন্ত কাল ভেদ করে অনন্ত সময়
চলার সঙ্গেই তবে পেতে হবে বিপুল সঞ্চয়।

যারা পথিকৃৎ, পথ রচনা করেছে বার বার
ক্রমশ চলার সঙ্গে তাদের জানাব নমস্কার,
তাদের জানাব কৃতজ্ঞতা।
কত ইতিহাস, কত ইতিবৃত্ত কথা
যুগ যুগ ধরে শুধু স্মরণের স্তম্ভ রচে যাবে—
সেসব স্মরণচিহ্ন আমাদেরই নমস্কার পাবে।

সময় চলেছে যদি
নিরবধি
সমস্ত চলার শেষে সমুদ্রের পতন স্থিতধী
হতে পারি যদি
তবেই জীবন ধন্য ; অন্য কিছু নহে—
যে অমর রহে, সেই রহে।

গোপাল ভৌমিক

জওহরলাল স্মরণে

স্তব্ধ হও, শান্ত হও,
মুখর রসনা ক্ষান্ত হোক :
যাকে নিয়ে এত কথা
এ উচ্ছ্বাস, নিদারুণ শোক
সে আজ সুদূরচারী,
কোন দূর নক্ষত্রের পারে
শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে
মেলেনি যা এ মর্ত সংসারে।

এ মুহূর্তে অর্থহীন
সব নিন্দা, প্রশংসা ও স্তুতি ;
তার চেয়ে শান্ত মনে
সে মহান আত্মার বিভূতি
এসো অনুভব করি :
এ দেশের নদী ধূলিকণা
যে মহান প্রেমে ধন্য
মনে মনে জাগে সে এষণা।

বাণী রায়

সাতাশে মে, উনিশশো চৌষট্টি

সারাদিন, সারারাত তুষার ঝরেছে শুধু।
তুষারের নদী আর তুষার পর্বত আর
তুষারের সৃষ্টি এক।
ভারতের মানচিত্রে সেদিন তুষারে
ক্যালেণ্ডারে দেখা দিল সাতাশের মে।

আমরা নিদাঘ রাত্রে টাইটানিয়া—ঘুমে
নীল আকাশের নীচে ছিলাম আমরা।
হৃদয়ে তুষার ঝরে জাগালো কখন,
অলক্ষিত তুষারের অগোচর রূপ,
রেডিওর আর্তনাদে একটি সংবাদ।

ক্রমে আরও গরমের উত্তপ্ত বাতাস,
ল্যু নিয়ে বয়ে এল দুরন্ত মরুর ;
তুষার শুকিয়ে গেল—লক্ষ সুমেরুর
কঠোর তুষারঝড়ে লাগলো উত্তাপ।
অর্ধ অবনত হ'ল জাতীয় নিশান।

কিন্তু যদি হৃদয়ের বন্দরে তাকাও,
অটল—অচল সেই জয়ের নিশান।
সে বীর নিরস্ত্র এক অচিন্ত্য সংগ্রামে
জাগালো আরক্ত পুষ্প ভারতশোণিতে
অনেকের মনে মানে নিরুদ্ধ বাসনা
এক মানুষের মধ্যে নিল পূর্ণ রূপ।
আমরা নিদাঘনিদ্রা ত্যাগ করলাম ;
আমরা পরীর রাজ্য ভুলে যে গেলাম,
আমরা একত্রে তাই শপথ নিলাম,
লক্ষ ফুলে চিতাভস্ম ঢেকে যে দিলাম।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লাল গোলাপ

ঘণ্টা বাজে। কোথায় গম্ভীর ঘণ্টা বেজে যায়।

আমি বিশ্বভুবন তোমার
প্রসারিত হাতের মুঠায় এনে দেব।
তুমি কিছু দাও।
তুমি একটি ফুল দাও।
রূপকথার লালকমল, দাও
টকটকে রক্তের মতো একটি গোলাপ।

তবু কাঁপে সমস্ত ঘরবাড়ি। তবু
আকাশ হাজার-টুকরো দর্পণের মতন চৌচির।
তবু গৃহদেবতার মুখ
বেঁকে যায়। চুরমার জনতা
ছেলেবেলাকার যতো অভিমানী বন্ধুর মতন
হঠাৎ অস্পষ্ট হয়।
ঘণ্টা বাজে। কোথায় উদাস ঘণ্টা বেজে যায়।

আমি দেব। আমি বিশ্বভুবন তোমাকে
এনে দেব।
তুমি দাও,
তুমি কিছু দাও,
তুমি একটি ফুল দাও।
রূপকথার লালকমল দাও
টকটকে প্রেমের মতো একটি গোলাপ।

যেন গুমরে ওঠে কেউ। যেন বলে ওঠে,
"ওরে ছেলে, ধৈর্য ধর।"
কে কাকে কী বলে, দ্যাখ,
জলস্রোতে ভাসমান, রক্তবর্ণ গোলাপের মতো
ওই তিনি কোথায় চলেছেন।
কে কাকে কী বলে, শোন,
বুকের ভিতরে
ভুবন-দোলানো ঘণ্টা বেজে যায়।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

তোমার দূরবীণ হাতে নিয়ে

তোমার দূরবীণ হাতে নিয়ে
ইতিহাসের বহু শহর জেনপদ ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করেছি।
দম্ভ জিগীষা মৈত্রী জেহাদের উত্থান-পতন উত্থান-পতনের মধ্যে
নূতন নূতন শিলালিপি ক্ষোদিত হতে দেখেছি
পরাস্ত ব্যথিত মুখ পশু অন্ধকারে তলিয়ে গেছে
বসেছেন পদ্মপলাশ বুদ্ধ
ধ্যানে।

সীমাহীন আকাশ আর পৃথিবী
নীল সমুদ্র ও শতশত বিস্ফোরক শহর
কোটি কোটি মানুষের বহু কোটি বাহু—ক্ষুধা, বন্ধুত্ব, ব্যবধান,
এক সাথে মিলাবার স্বপ্ন আমারও।
আদর্শে আরূঢ় দৃঢ়
নূতন স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষ আমি।
পৃথিবীর আগাছা উপড়ালে, হৃদয় আবাদ করলে, সোনা ফলবে
এই আশা আমিও পোষণ করি।

তোমার দূরবীণ হাতে নিয়ে
ইতিহাস থেকে ভূগোলের এক টিলায় আজ উঠে এসেছি
সীমান্তের শেষ ঘাঁটিতে।
নখদন্তহীন বিধ্বস্ত ট্যাংকের উপর পা রেখেছি,
যেন শত্রুর আক্রামক নীচাশয়ের উপর,
ছিন্নডানা বাজপাখির গুলীবিদ্ধ আর্তনাদ আর্তনাদ আর্তনাদ
আমার লক্ষ্যভেদী আত্মবিশ্বাসের ক্রমান্বয়ী স্বরলিপি।

নূতন স্বাধীনচেতা ভারতবর্ষ—তোমার উত্তরাধিকার—আমি ;
আমার বিধ্বংসী বারুদের ক্রোধ পবিত্র, বিদ্বেষ শূন্য কিন্তক্ষমাহীন,
শত শত শহীদের রক্তে ধৌত পবিত্র সেই অভ্রংলিহ ক্রোধের মধ্যে
তোমার মহান স্মৃতির তর্পণ আজ সম্পন্ন।

সীমাহীন আকাশ আর পৃথিবী
আদর্শের উজ্জ্বল তারকা এবং আততায়ী, অগ্ন্যুৎপাত, প্রতিরোধ,
ইতিহাস এবং ভূগোল
তোমাকে এবং তোমার অনুগামী দূরবীণগুলিকে
একই সীমান্তে, একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে।

উমা দেবী

প্রণাম

যে পুরুষ বহুমেধী আদিত্যবরণ,
তাকে আমি প্রণাম জানাই।
তমসার পারে তার যে পদচারণ
আলোকের উৎসমুখ তাই।

শতসূচীমুখধারে রেখেছিলো অস্তিত্বকে তার
যে পুরুষ, তাকে আমি জানাই প্রণাম,
ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ এক তরঙ্গাকুল পারাবার
পার হয়ে সে পেয়েছে শান্তি অভিরাম।

সেই বহুমেধা এক পুরুষকে প্রণাম জানাই
সুরেলা হয়েছে তার ছোঁয়া পেয়ে প্রাণের প্রলাপ,
মৃত্যুতে যে প্রীতচিত্তে দিয়ে গেছে অপরূপ
শ্বেতভস্ম আর এক রক্তিম গোলাপ।

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জওহরলাল নেহরু

কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে নামে গ্লেসিয়ার
উত্তরে সে আর্যাবর্ত—দক্ষিণেতে আর
ঝড়ে দোলে ভারত-সাগর।

ভারতবর্ষের আজ জ্বর বড় জ্বর।

আকাশ প্রসন্ন মোটে নয়—
কালো মেঘে, কুয়াশায় বারবার দিগ্‌ভ্রম হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থ কিংবা মালাবারে
চতুর চক্রান্ত ঘোরে মুখোশেতে মুখ ঢেকে অলিন্দে, প্রাকারে ;
কূলে-উপকূলে গড়ে বিরোধের দৃঢ় ভিত যত প্রতিকূল—
নিদ্রাহীন একান্ত নির্ভুল
তুমি তবু জেগে আছো একা
প্রাণের উত্তাপে ছুঁয়ে ভারতের প্রতি প্রান্তরেখা।

হিমালয়-শির চুমি
মাতৃভূমি
অনেক পাথর বেছে অবশেষে খুঁজে নিল একটি জহর—
নর্মদা-জাহ্নবী-কলস্বর
বাজালো অশান্ত রক্তে স্বপ্নের মধুর ঝমঝমি ঃ
নোতুন ভারতবর্ষ তুমি।

যে-ভারত চোখ মুছে জাগে ঃ
গঞ্জে, গ্রামে, জনপদে অগ্রগামী তুমি পুরোভাগে—
কৃষকের ভাই ধরো লাঙলের ফাল ঃ
সারেঙের সাথে টানো হাল ঃ
মেহনতী মানুষের বেদনার সাথী—
স্বস্তির রুমালে তার স্বেদাশ্রু মুছিয়ে জ্বালো

টকটকে লাল সূর্যভাতি ;
একটি বিশাল জাতি
মালার মতন গাঁথো হৃদয়ের তারে—
পৃথিবীর এই এক ধারে !

গন্ধকের কটুগন্ধ বারুদখানায়
প্রাণ বায়ু চেয়ে তবু এ সভ্যতা যখনি হাঁপায়—
সেখানেও তুমি অগ্রদাতা
স্নেহাতুরা যেন মাতা
দ্রুত ছুটে গিয়ে ঢালো দুধ-শান্তিজল ঃ
নীল ঠোঁটে তুলে ধরো হৃদয়-পানীয় টলোমল;
তবু যদি ক্ষুব্ধতার ছাই-চাপা আগুন ধোঁয়ায়—
নিদারুণ চিন্তান্বিত দেখি যে তোমায় !

জীবনের তেষট্টি বছর
পুরোনো পাতার মত তাই যবে টুপটাপ ঝরে পর-পর
প্রশ্ন কি করেছে অন্তর ?
তুমি যত বেগে ব'য়ে যাবে—
অতীত প্রহরগুলি খুঁটে খুঁটে কেউ কি কুড়াবে !
ঝিনুকের বুকে-জমা মুক্তোর মতন
তোমার বিশেষ নামে
স্মৃতির সুবর্ণ এলবামে
তারাও যে ফ্রেমে-গাঁথা মহা আয়োজন !
তুমি যদি না রাখো খেয়াল ঃ
তোমাকে সবাই চেনে—জওহরলাল ।

কৃষ্ণ ধর

রাত্রির অঙ্গিকার

Long years ago we made a tryst
With destiny...

Jawaharlal Nehru
August 15. 1947

আমরা সবাই সেদিন মাঝরাতে হাজির
হয়েছিলাম
তখন ঘুম ছিল না, রক্তে ছিল জাগরণের মত্ততা
যদি দেখতে নদীর স্রোতে অশ্রুর প্রতিশ্রুতি
পৌঁছেছিল অসম্ভবের মোহানায়
যদি জানতে

আমরা একহাঁটু কাদা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম
সেই জল থেকে উঠে আসব বলে

আজও সেই নদী আছে
অশ্রুগুলি শুকিয়ে জমাট পাথর
সেখানে মাথা কুটছে এক অবাধ্য ক্ষোভ
যদি জানতে
আমাদের বুকে ভালবাসা ছিল
তুমি যদি দ্বিধা না করতে
কম্পিত করতলে ফুটতো লাল পদ্ম

অনেক দূর যাবো বলে বেরিয়েছিলাম
নদীর ঢেউ ধরে ধরে···
অরণ্যের পথ ধরে ধরে···
মানুষের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে···

হল না
তুমি অসময়ে যদি ফিরে না যেতে ॥

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

নেহরু জওহরলাল—একটি নাম-একটি যুগ

নেহরু জওহরলাল—একটি কতো প্রিয় নাম ভারতবাসার,
হিংসার নখরে ক্লিষ্ট পৃথিবীর একটি আশ্বাসের নীড়
পরম শান্তির ; আর তাঁর শুভ অভ্যুদয়,—বিশ্বের বিস্ময়।
মুক্তিকামী জনতার জয়ধ্বনি, স্বতস্ফূর্ত আবেগ, উল্লাস
দেখে তাঁর জন্মেজয় হৃদয় দিয়েছে বরাভয়
নিপীড়িত জনগণে ; স্বপ্নে তাঁর দীপ্ত এক যুগের উদ্ভাস।

মৈত্রীর মহান মন্ত্র কণ্ঠে, বুকে অমিত সাহস,
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে রক্ষায় দৃঢ়চিত্ত অনলস,
সমর্পিত প্রাণমন ; কী দুর্বার কর্মধারা তাঁর
ছুটে গেছে দেশে দেশে মানুষকে ভালবাসিবার
অমোঘ ইচ্ছায় ; বিশ্ব, ভারতের আত্মার মহিমা
দেখেছে জওহরলালে,—বাক্যে মনে ঔদার্যের নেই যাঁর সীমা।

পৃথিবীর অন্ধকার রাত্রে আজও যেথা বাজে যন্ত্রণার বীণা,
ঝড়ের পাখিরা ওড়ে ভীত ত্রস্ত, আর্তনাদে আকাশ মুখর,
সেখানে শুধাও গিয়ে তারা সাথী হারায়েছে কিনা,
কান পাতো, ইথারে ইথারে বাজে শান্তিকামী জওহরের স্বর।

নেহরু জওহরলাল—একটি যুগ ভারতবাসীর,—
যেখানে রয়েছে আশা, সফল কর্মের স্রোত, আশ্রয়ের নীড়।

দুর্গাদাস সরকার

রক্ত গোলাপ

ক্বচিৎ কখনো আসে
একজন
জীবন-নির্মাণে।
মানুষ গড়ার সেই মহাকারিগর
একদিন
মেশে কোটি কোটি পরমাণুর ভিতর।
তার শুধু নেই কোনো—জীবনের ভয়ঃ
যে সব মানুষ আরো রয়ে গেল, পৃথিবীতে
হারাবার মত তারা নয়।
তবু আজ শোকস্তব্ধ মলিন আকাশে
আমাদের অশ্রুবিন্দু বাষ্প হয়ে ভাসে
রৌদ্রতপ্ত জ্যৈষ্ঠের বাতাসে।

কোথায় আগুন যেন ধিকিধিকি জ্বলেঃ
—শিল্পের মন্দিরে ?
সে আগুনে লেখা হয় আজ কোন্ নাম ?
লেখা থাক তাতে, বন্ধু, তোমার সংগ্রাম।

চিরকাল থাকে না ত চিতার আগুন।
প্রতিদিন আসে না ফাগুন।
এমনি অবাক—
বাগানে ফুটেছে আজ প্রথম গোলাপ।
নেই তার অন্য কোন নাম।
যদি আমি এই ফুল তোমাকে দিতাম।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

হে জ্যোতির্ময়

তোমার বুকে ছিল অমেয় প্রাণশক্তি, চোখে প্রজ্ঞার আলো,
সর্বাঙ্গে এক অপরূপ দেবদূতের জ্যোতি,
ওষ্ঠাধরে তথাগতের শান্ত-মধুর হাসি,
কণ্ঠে অমোঘ আশ্বাস আর শাশ্বত শান্তির বাণী।

সম্পদের সুখশয্যায় তোমার জন্ম ;
তবু সম্পদ তোমাকে ভোলাতে পারেনি।
বিলাসিতার ক্রোড়ে তুমি লালিত পালিত।
তবু বিলাসিতা তোমাকে ভোলাতে পারেনি।
সম্মানের শিখরে তুমি ছিলে সমারূঢ় ;
তবু সম্মান তোমাকে টলাতে পারেনি।
তুমি যে দেখেছিলে শৃঙ্খলিতা তোমার দেশমাতা,
তুমি যে জেনেছিলে তোমার জন্মভূমি দুঃখিনী, অশ্রুমুখী ;
নিরন্ন বিবস্ত্র তোমার দেশবাসী, তোমার ভাইবোন।
তাইতো উচ্চাসন ছেড়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো
তুমি নেমে এলে মাটিতে, সাধারণ মানুষের সমতলে—
বিশাল জনতার মাঝখানে।

লাঞ্ছিতা দেশ-জননীর বন্ধন মোচনের জন্য
নিপীড়িতের দুঃখ ভার দূর করার জন্য
গর্জে উঠলো তোমার প্রতিরোধের কণ্ঠস্বর।
হাসিমুখে বরণ করলে অত্যাচারীর লৌহকারা,
আত্মশক্তিতে চূর্ণ করলে মিথ্যাদম্ভের স্বর্ণ সিংহাসন।
যে-জ্বলন্ত দেশপ্রেম ছিল তোমার বুকে,
তা ধন্য হলো পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে।

অসত্য অন্যায় আর অশুভের সঙ্গে
আজীবন ছিল তোমার কঠোর সংগ্রাম।
নীচতা, স্বেচ্ছাচারিতা, রাজ্যলিপ্সা আর যুদ্ধ লালসাকে
তুমি চিরদিনই দিয়েছ নিদারুণ ঘৃণা।
মানুষ-জন্তুর হুহুঙ্কারের প্রতি
ছিল তোমার তীব্র তিরস্কার, ধিক্কার।
পশুশক্তির চিরশত্রু তুমি,
তাই তুমি এক বিদ্রোহী দুর্ধর্ষ সৈনিক।
প্রেম তোমার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, রণধর্ম
ন্যায় ও সত্য তোমার দেহের বর্ম।
নিজের বুকের অস্থি আর বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে
তুমি গড়তে চেয়েছিলে সভ্যতার অভ্রভেদী মিনার।

যে মানবতার আলো তুমি জ্বেলে গেলে, তা অম্লান, অনির্বাণ—
নিরাশার নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে
আজো তা জ্বলছে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো।
তোমার কণ্ঠের অভয়বাণী আজো আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত ;
বিশ্ব-সাম্য মৈত্রী মন্ত্রের উদ্গাতা তুমি,
মানুষের মনোরাজ্যে পাতা আছে তোমার রাজাসন।
হে জ্যোতির্ময় অমর সত্তা, তোমাকে নমস্কার।
হে বীর সৈনিক, হে মানবপ্রেমিক, তোমাকে নমস্কার।
হে পরম শান্তির দূত, তোমাকে নমস্কাব।

আনন্দ বাগচী

স্বপ্নের সম্রাট

বহুঝড় বন্যা গেল দেশ জুড়ে, দারুণ সঙ্কট
অনেক বিক্ষোভক্ষোভ, অন্তর্ঘাতী জন কোলাহল
চতুর্দিক জুড়ে শুধু আলেয়ার আলো মরীচিকা,
ভ্রান্তির বিলাস, বহু ভানুমতীর উচ্চাঙ্গের খেল ঃ
রাজনীতি যাকে বলে, ডানে-বামে বিচিত্র জলধি
কেবল তরঙ্গ ভঙ্গে নিঃসঙ্গ সাগরবেলা ছোঁয় ।

দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার তুমি, জনপথ রাজপথ করে
দ্রুতবেগে চলে গেছ নির্ভীক হৃদয়ে ঋতুরাজ
তুমি চির যুবা, তুমি চিরজয়ী পতাকা বাহন ;
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি বিনিদ্র নয়নে চেয়ে আছে,
মৃত্যুহীন মানবতা, বুদ্ধ অশোকের সঞ্জীবনী
বিশল্যকরণী হবে, অমৃতের পুত্র কোনখানে ?
শান্তিনিকেতন হবে জতুগৃহ

অবিচল স্বপ্নের সম্রাট,
ব্যনার হেডিংএ জ্বলে প্রত্যহের মারাত্মক ষ্টান্ট !

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার উষ্ণীষ আজ

(শ্রীজওহরলাল নেহরু স্মরণে)

তোমার উষ্ণীষ আজ মেঘে লেগে আছে, আজ তোমার হৃদয়,
তোমার ভস্মান্ত স্মৃতি ত্রিপথগা গঙ্গার ধারায় মিশে আছে।
নগাধিরাজের দৌত্যে মহামহিমার্ণব সাগরে
নাগের মতন বাঁকা নিবীত এলিয়ে তুমি চলে গেছ।
এক-দেশ-জনতা তোমায় গণঞ্জয়
বলে অভিবাদন জানাতে এলে তুমি সেই রাশি রাশি কাঁটার আদর
ক্ষরিত শোণিত ঢেলে মস্ত এক গোলাপ ফুটিয়ে অনায়াসে
যে-কোনো শিশুর হাতে সে গোলাপ তুলে দিয়ে চলে গেছ।
আর ভূ-ভারত জোড়া কাব্যের বাগান শুধু কাগজের ফুলে
কীর্ণ হয়ে যেতে দেখে সেই শুভ্র নাগাখ্য নিবীত
পুরোণো দড়ির মতো তারই এক নিষ্পত্র শাখায় আছে ঝুলে
দিবসনিশীথ।

সুনীল বসু

একজন নিন্দুকের উপলব্ধি

আমি যে অতি নিন্দুক ঘোর নিন্দুক,
না হলে চায়ের টেবিলে, অফিসে, কাছারিতে
না হলে যে-কোন আড্ডায় যে-কোন তর্কে তোমার নিন্দা,
তোমার সমালোচনা, তোমার ভুলচুক্ নিয়ে অবিশ্রান্ত তর্ক
করেছি কেন,
আমি ভারতবর্ষের বিশাল মাটিকে ভালোবাসি নি,
আমি নদী পর্বত গিরি গুহা ক্ষেত খামার চাষী মজুর
আমি দারিদ্র্য ক্ষুধা অনাহার উপবাস
আমি শয়তান, সুবিধেবাদী, দালাল, জোচ্চর, দেশদ্রোহী
এসব আমি কিছুই দেখিনি, জানি না, চিনি না, শুনি না
আমি ধোপদুরস্ত শহুরে-বাবু, চায়ের কাপের সঙ্গে রাজনীতির ঘোর চর্চা
এবং দেশ নেতাদের নিন্দায় পিণ্ডদান করি,
আমি তর্কচঞ্চু সর্ববোদ্ধা নিষ্ঠুর নিন্দুক।

অথচ সমুদ্রে এতো ঢিল ছোঁড়া, কোন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয় নি
এত বাক স্বাধীনতা, কোনদিন কণ্ঠরোধ হয় নি
এত সুউচ্চ গড়িমা
সমালোচনার খন্তা শাবল দড়ি পরিশ্রম, পরাজয়ের উদ্যম
সেই আদর্শের সানুদেশে বহুবার আমাদের বিপরীত অভিযান
পণ্ড হয়ে গেল,
দেখেছি গোটা ভারতবর্ষ তোমার পিছনে
দেখেছি সমস্ত পৃথিবী তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে
দেখেছি আমার অবিশ্বাস
কোটি মানুষের বিশ্বাসের প্রচণ্ড ফুৎকারে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে
আমি বার-বার তোমার কর্ম-উদ্দীপনার চুল্লীর ভিতর
তোমার শুভ সংকল্পের তেজিয়ান ঘোড়াগুলোর সামনে
বার-বার অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলাম

আমি ক্লান্ত হয়ে নিজের নিন্দার জঞ্জালে নিজেই
ধুলো হয়ে ধ্বসে গেলাম।

তোমার গায়ে একটু আঁচড় দিতে গেলে
বুঝেছি এই মৃত ভারতবর্ষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসতে হবে
বুঝেছি চায়ের কাপের রাজনীতি পায়ে আছড়ে ভেঙে
বিশাল ভারতবর্ষের মাটির চন্দন কপালে পড়তে হবে
বুঝেছি সুখ নয়, কোটি জনতার জন্যে আমার নিদ্রাহীন চিন্তায় মগ্ন হতে হবে
বুঝেছি ফুলবাবু নয়, বস্ত্রহীন, খাদ্যহীন,
স্বাস্থ্যহীন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে
আশ্বাসের অভ্রান্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে
আমি জানি, সেদিন তোমার আমি আর নিন্দা করব না।
দুর্বল হাতে দু' একটা সমালোচনার ঢিল সমুদ্রে ছুঁড়ে
আমি আর খেলা করতে চাইব না
আমি জানি অন্তত তখন ছোট ছোট অভিযানে আমার সমুদ্রের
কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে
অতএব আমার নিজস্ব জাহাজ, সমুদ্রকে নমস্কার করে
খুব সাবধানে ভাসাতে হবে॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

জওহরলাল নেহরু

কোথাও যে কিছুই থেমে থাকলো না,
এক-এক স্তবক দৌড়ে গিয়ে তৃণাদপি অদর্পিত চড়ুই
প্রাচীন প্রথা রাখলো তাদের,
সে-শুধু তোমার জন্য।

আমাদের মা
'সুমন, বাবা সুমন,
অন্ধকার হয়ে এল।
সব অন্ধকার হয়ে এল'
বলতে-বলতে মুষড়ে-পড়া দিগ্বধূর মুখের উপর
হলদে মাথা খঞ্জন পাখিদের খুলে দিয়ে বলতে থাকল ঃ
'ওরা ওকে চিরদিনের মতো পেয়ে গেল।'

মাকে আমি সান্ত্বনা দিতে গিয়ে
বোকা বনে গিয়েছি ;
কেননা, আজকের মতো কখনো
কোনো মন্দিরে একসঙ্গে এত শিশু আমি দেখিনি,
বুঝিনি যে দুঃখের বাগানে শিশুরা এমন করে দেবতা হয়ে যায়।

'আমি মন্দিরের গর্ভগৃহে যাবো, আমায় তোরা ছেড়ে দে
'আমি তিব্বতী বণিকদলের কাছ থেকে মৃগনাভি আনতে চলেছি
'কাকে সাজাতে চলেছ তোমরা কাকে ?
'ওগো তোমরা আভুবন হুলুধ্বনির বকুল ছড়াও
'আততায়ীরাও কি আত্মা বদ্‌লে নেবে বৈতালিক গানে ?
'শোনো তোমরা, দরোজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দিয়ো না আর

'শ্বেতপাথরের মেঝের উপর দিয়ে রৌদ্রের নদীটিকে বহে যেতে দাও
'ঝাউ-জানালা দিয়ে মানুষের মুখ দেখবো আমি এবার থেকে—'
সমস্ত পথে-পথে জলপ্রপাতের উচ্ছসিত সংলাপ শুনছি, আর
স্তম্ভিত ঠোঁটের অরণ্যে অরণ্যে বিস্ময়ের মর্মর।

চৌমাথায় উচ্ছল যে-শিশুটির হাত থেকে
সাতরঙের ঘুড়িটা কেড়ে নিল সূর্য
তার বুকের ঝিনুকে গোলাপ গুঁজে দিয়ে
আমিও ঐ ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবো।

বিশু মুখোপাধ্যায়
পুণ্যশ্লোক

রঙিন মনের বেড়ে প্রতীক সে রক্ত গোলাপ
রূপে-গন্ধে ঘটায় যোজনা ; মৌল, আর্য, দার্শনিক
মনের সুষমা নিয়ে ছিলে বাঁচি হে মহাপ্রাণ !—
সমীক্ষার নাহি ধারি ধার।

সার্বিক সততা সদা, অহিংসার প্রত্যক্ষ মডেল ;
—জাড্য-জয়ী, বুদ্ধিদীপ্ত, বৃহত্তম হিতকর প্রাণ—
পৈশুন্যের ক্ষুদ্রতম স্থান, নাহি তব জীবনসীমান্তে !

অমানিশা মাঝে তুমি জ্যোতিষ্ক উজ্জ্বল ; নৃশংস
কর্বূর হতে রক্ষক নিয়ত ; নরাধম মাঝে তুমি চির
পুণ্যশ্লোক—বিস্তারি গিয়েছ তব প্রেম সর্বলোকে !

তোমার আকল্প আর সংকল্প যে আছিল
বিরাট ; উদার 'এথিক্স' তব সম্প্রীতির প্রসারণে
যে প্রত্যয়ে বেঁধেছিল ঠাট,—খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন বিশ্বে,
সংপ্লব-বিপ্লব মাঝে চূর্ণ হ'ল তাহা—বিসংবাদে
ব্যর্থ তব হ'ল পঞ্চশীল !

তবু আজ ভারতের তাজ তুমি ! শুভ্র, শুদ্ধ
স্মৃতি-তাজমহলের সম, না থেকেও জৈব-দেহে
রয়েছ দাঁড়ায়ে, রাজ-রাজেশ্বর হয়ে এ-জম্বুদ্বীপের
পুরোভাগে !—হোক এ জাগরস্বপ্ন, হোক ভক্তিরতি
—অপার মহিমা তব রাখে করে পতি সবাকার !

অতীতের কোন একদিন, অবশ্যই আসিবে সুদিন,
সেদিন, তোমার শাশ্বত সত্য, সাম্য, সদাচার-পৃথিবীর
কদাচারী নীতিভ্রংশ নর-চীন, পাক, আর তুল্য যত সে
পামর, সংকটে শরণ লবে শ্লাঘায় শ্রদ্ধায়—আরো
বহু আবশ্যকতায় !

কবিতা সিংহ

আমার সম্রাটের প্রতি

সম্রাট মুকুট খানি রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন !
পিছে রেখে গিয়েছেন কীর্তি যত, খ্যাতি যত, ভঙ্গুর সম্মান
ছিন্নপত্রে ম্লান ওড়ে অলংকৃত শোকের প্রস্তাব।
শব্দ মায়া জীর্ণ লাগে, শব্দ মায়া আসুরী রচনা।
শোকের উৎসবে খড় ঝঙ্কৃত বাজনা
বড় তীব্র আলো বেঁধে !

আমরা কেউ উৎসবে যাব না !
ভঙ্গীর পোষাকগুলি গায়ে বড় বাজে
শব্দ যদি ব্রহ্ম তবে শব্দের জাঙাল ভেঙে
আজ শুধু প্রেম তুলে আনি

শান্তি পারাবারে আজ তাঁহার তরণী।
শান্তি পারাবারে এক মোহন তরণী।
মোহন তরণী তাঁর প্রেম ভিন্ন পাথেয় নেবে না
এসো আজ দুঃখে এক, প্রেমে এক, সম্মিলিত হেঁটে যাই
তাঁহার মিছিলে।
নতশির হেঁটে যাই একত্রে, একেলা !

অশ্রুগুলি ফুটে থাক লজ্জা নেই ! প্রেম
প্রেম লজ্জারও চেয়ে দীন !
এই এক সমাধিতে পৃথিবীর অন্য ফুল ব্যর্থ হয়ে গেছে !

সম্রাটের সমাধিতে অন্য ফুল ব্যর্থ হয়ে গেছে।
কারণ হৃদয়গুলি অসংখ্য গোলাপ।
কারণ হৃদয়গুলি রক্তের গোলাপ।

কারণ আদেশ পেলে যেকোনো হৃদয়
গোলাপ কাঁটায় বুক সারারাত
সারারাত যেকোনো হৃদয়
সমস্যা বিবর্ণ ফুল লালে লাল করে দিতে পারে।
কারণ আদেশ পেলে যে-কোন হৃদয়
সমস্ত বিবর্ণ ফুল লালে লাল করে দিতে পারে
সম্রাট বরাত দিলে যে-কোন হৃদয়।
বোতাম বন্ধের মুখে এক সন্ধ্যার আয়ু জেনে গিয়ে যে-কোন হৃদয়
তবু খুব অদ্ভুত রক্তিম এক গোলাপের কুঁড়ি হতে পারে।

এই এক সমাধিতে আজ ফুল বাড়তি হয়ে গেছে।
যতদূর চেয়ে দেখ আসমুদ্র হিমাচল রক্ত রক্ত ফুটে আছে
শান্তি পারাবারে আজ তাঁহার তরণী।
শান্তি পারাবারে তাঁর মোহন তরণী।
মোহন তরণী তাঁর প্রেম ভিন্ন পাথেয় নেবে না।
সম্রাট মুকুট তাঁর রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

সব ফেলে ফুলগুলি নিয়ে গেল মোহন তরণী।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আরক্ত গোলাপ

পৃথিবী কবিতা নয় (কখনো ছিল কি ?), মানবতা
অঢেল বিশ্বাসে প্রেমে তবুও নিশ্বাস নিতে চায়,
এক পৃথিবীর স্বপ্ন—শান্তি মৈত্রী প্রীতি করুণার—
স্বপ্নকে বাঁচাতে গিয়ে আহত অবাঙ্ বেদনায়

মানুষ আবহমান তবুও নির্ভীক, অন্যতর
আত্তিলা-আঁধার ভেঙে প্রত্যহ অনন্য সূর্যোদয়,
এই রূঢ় শতকেও তাই বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের
অব্যয় ভারতে চাহে রাজনীতি কাব্যের আশ্রয় !

সোনার পাথরবাটি—সহৃদয় রাজনীতি—তাই
আঘাতে আঘাতে দীর্ণ আহত স্বপ্নের চাপ-চাপ
জমাট রক্তের শিল্পে প্রাণবন্ত ত্রিবেণী হাওয়ায়
অমৃত আনন্দে দোলে ত্রিকালীন আরক্ত গোলাপ ॥

জয়ন্তী সেন

শিখা অনির্বাণ

শান্তির সুস্মিত দীপ শুভ্রজ্যোতি শিখা অনির্বাণ,
পারাবত-শ্বেতপক্ষ আন্দোলিত নিখিলের বুকে—
পৃথিবী বসেছে জপে নামমগ্ন, সেই প্রিয় নাম,
পৃথিবীর ধ্যান-স্বপ্ন উদ্ভাসিত স্মৃতির ফলকে।
তবুও বিচ্ছেদ ভয় শোকাহত হৃদয়ের তারে
নিষ্ঠুর রাগিনী তার বাজাবেনা, নিবিড় প্রত্যয়
সোচ্চারে প্রকাশ করে জীবনের নিশ্চিত গৌরব,
ফুলের সৌরভ বড় ফুল হতে, প্রেম মধুময়।

শান্তির সুস্মিত দীপে অনির্বাণ আলোক ক্ষরণ
সে ধারায় শুচিস্নাত বিশ্বলোক জেনেছে মরণ
স্মরণের কাছে আজও পরাভূত—তাই স্মৃতিভার
হৃদয়ের বড় কাছে দুলে ওঠে দ্যুতি মনিহার।

অঙ্গীকার বুকে নিয়ে অন্ধকারে আলো চিনে চিনে,
পৃথিবী প্রণাম রাখে পদপ্রান্তে বিদায়ের দিনে।

সুকুমার রায়

সুন্দর

বর্ণে চর্মে বন্দী কি সুন্দর ?
স্নিগ্ধতার সৌন্দর্য বুঝি কুসুমে আস্তীর্ণ ?
তাই যাকে ভালবাসি তারই রূপ
আরোপ করি সৌন্দর্যে।
মুগ্ধ মুহূর্তের ভাবনার খেই নাই
তাই গভীরতার পরিমাপ করি না।
ছুটির দিনে ক্লান্তির অবসানে
সুন্দরকে ভেবে দেখি—
দেহের বাইরে—মনের রাজ্য,
দুটো যেন একসূত্রে বাঁধা।
যেখানে সাজানো বাগান—পুষ্পের সুরভি
শক্তির সমারোহ—অমিত আশা,
অশান্তির প্রক্ষেপে—শান্তির কামনা,
সৃষ্টির উল্লসিত স্বপ্ন,
সেখানেই অতনু গৃহের অর্গলমুক্ত নিস্পৃহ প্রবেশ।
শিব-দৃষ্টিচ্যুত ভস্মে তিল তিল করে গড়া
রূপের আবরণ তলে
প্রাণোচ্ছল মোহন জীবনের স্পন্দন।
সেই সৌন্দর্যের প্রতীক প্রতিষ্ঠিত
সর্ব হৃদয়ের শতদলে, মাঠে, ঘাটে, জনতার
বন্দরে, গঙ্গায় উদার হিমালয়ে
সুন্দর।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে

আমাদের চারিদিকে জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ প্রবাহ
অনির্বাণ হয়ে আছে ঃ আশা-আলো দুঃখ-ভয় আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ
পরিণামী হতে থাকে। আমাদের সকলের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা—
প্রায় আমরা তরঙ্গ-মথিত হয়ে ভাসমান স্রোতের জলের
গতিপথে। আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি না
বিপরীত প্রবাহকে। বিচিত্র বহুধা ব্যাপ্ত বহুবৃত্ত জীবনের টীকা
ভাষ্য প্রভৃতি কিছু পড়তে পারি না! তবু সূর্যোদয়ের
সম্ভ্রান্ত আলোর কাছে আমাদের হৃদয়ের গভীরের বীণা
যন্ত্রণায় বেজে ওঠে মাঝে মাঝে; প্রার্থনা-প্রণত
আমরা সমর্পিত হই—অন্য দূর চৈতন্যের কাছে।
তবু আমরা সাধারণ—প্রত্যহ প্রশ্নের অন্ধকারে
ভাসমান।

কিন্তু কেউ কেউ আছে স্পষ্ট উন্নত
বলীয়ান চেতনায় উন্মাদ তরঙ্গকে অমল উদ্ভাসে
বিপরীত যোজনায় সৃষ্টিতে সাজাতে পারে। জীবন-ব্যাপারে
সম্রাটের মত তারা অটল উন্নত মহিমায়
বিরুদ্ধ ঝড়ের মুখে অপরূপ সৌর তপস্যায়
নন্দিত দাঁড়াতে পারে। সে রকম উজ্জ্বল প্রতিভা
দুর্লভ পৃথিবীতে। তবুও তাঁদেরই জন্য এ পৃথিবী স্বর্ণ-প্রতিমা
বার বার। জনতার প্রতিনিধি—লেনিন লিঙ্কন—
তাঁদের স্মৃতিরা আজো সময়ের স্বপ্ন-সন্নিভা
উত্তরণে অনিন্দিত; প্রত্যহের পরিচিত সীমা
অসীমে ছড়িয়ে দেয়—ঃ আমাদের চারিদিকে উজ্জ্বল চারণ
বিপদে দুঃখে ভয়ে ফিরে দেয় জীবনের সম্ভ্রান্ত মহিমা।

হয়তো অনেক নদী ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়তে পারত এ প্রান্তরে ;
অন্নের জলের শিল্প ভরে দিতে পারত দেশ সবুজে সোনায় !
তবু সে অনেক ঝড়ে আমাদের জীর্ণ এই নৌকার শিয়রে
অন্ধকারে একা একা স্থির ছিল, প্রভাতের পদ্ম-আভায়
দেখেছি সে ফিরে আসে আমাদের মুগ্ধ উপকূলে।
গোলাপের পাপড়িগুলি ঝরে পড়ে গেছে আজ ধূলে,
অতন্দ্র প্রহরী তবু সীমান্তের শীতে ও বর্ষায়
আমরা আজো স্থির জেগে আছি ;
বরফ গলবে জানি, পাথরে ফোটাব ফুল, জানি ভোর খুব কাছাকাছি।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

১

আশ্চর্য অরণ্যের কথা জেনেছিলাম, রূপকথার মতো
যে অরণ্য অভয়ঙ্কর দুর্গম অথচ শান্ত দীপ্ত শোভানত
সে অরণ্যের গভীরে নাকি গান ছিল, সূর্যের প্রাণ
ফুল ফোটাতে চেয়েছিল যৌবনের
দূর থেকে দেখা যেতো
সে অরণ্যে বসতি এক ঋতুরাজ ঋজু বনস্পতি
ইচ্ছে হলে যেতে পারি ওইখানে, ওইখানে…
ইচ্ছে হলে রূপকথার মতো…

২

অরণ্যে যাবো না আর দেখবো নাকো সেই বনস্পতি
যে ছড়ালো মাটিতে স্নেহ মনে মনে
অঙ্গীকারে মাটিকে আপন
দেখবো নাকো ঋজু সেই বনস্পতি ধীর অতঃপর ;

অরণ্যে সহসা ঝড়, কী দুর্দৈব অরণ্যে ঝড় !

ধীরেন ভৌমিক

স্মৃতির পটে

উজ্জ্বল স্মৃতির চিত্র জ্বালাবেই রাঙন আকাশ
উৎকীর্ণ মেঘের বুকে ছাপা থাক তোমার অন্তর ;
শুভ লগ্নে এনে দিল সূর্যের মতন
প্রভূত আলোক রশ্মি অমৃতের ধারা
মনীষী তাপস তুমি ভারত রতন
মুক্তির আশ্বাসে লাল গোলাপের রঙ।

রমেন দাস

রক্ত গোলাপ

কারণে বা অকারণে আকাশে যখনই রাখি চোখ,
মেঘে ঢাকা তারাগুলো সব—
বেদনার ভারে কাঁপে ; অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে
পাখিরাও বিষণ্ণ নীরব।
শতাব্দীর অন্তরাত্মা শান্তি খুঁজে খুঁজে
ক্লান্ত ; তবু পেতে চায় অমৃত-সন্ধান,
বিক্ষত সংগ্রামী মন বিপ্রলব্ধ জীবনের হাটে
পরাভূত, বেদনায় ম্লান।

অথচ এখানে এক আশ্চর্য রক্ত-গোলাপ—
প্রত্যয়ের স্বপ্ন আঁকে ঃ নক্ষত্রই সূর্য হবে,
মুছে দেবে মিথ্যা অভিশাপ !

হরেন ঘোষ

শান্তির উদ্দেশ্যে

পায়ে পায়ে পথ চলে সব কাঁটা দূর করে
তুমিই শিখিলে
শান্তির সুস্মিত বাণী দিকে দিকে আশ্চর্য নিখিলে।
প্রত্যহের হাঁটাপথে নির্বোধেরা বকেছে প্রলাপ—
এখন সভার শেষ কী ভীষণ রিক্ততায়
নতমুখে খুঁজে ফিরছি কোথায় গোলাপ।

আমার মনের কোণে জড়ো হচ্ছে ভীষণ ভয়ের ভীতি
অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছি কারা যেন ছুরিকা শানায়
মুছে দিয়ে সাবলীল সূর্যস্নাত স্মৃতি,
তাদের হৃদয়ে নেই প্রেম-ভালোবাসা প্রীতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

হে কপোত শান্তি আনো রিরংসায় আলো দাও
তুমি নিরবধি!

শিপ্রা পাল

মৃত্যুর নির্জনে

মৃত্যুর ছিলোনা সাধ্য অন্তিম যুগের ইতিহাসে
রক্তের স্বাক্ষর রাখে : পৃথিবীর সত্তা অবয়ব,
রুগ্ন বেদনার ক্লান্তি বর্ণহীন নিস্পৃহ চেতনা
নিস্পত্র বৃক্ষের মতো জন্মান্ধ নিঃসঙ্গ পড়ে আছে।
অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ঢেউ নির্জন নীলের শীর্ষে স্থির
মগ্ন সমাগত : যেন জেনেছিলো দৃপ্ত অভিযানে,
সুবর্ণ মন্দির চূড়া ফুল চন্দনের গন্ধ ম্লান ;
ভেসে যাবে ঘূর্ণিস্রোতে অনির্বাণ আলোর সন্ধানে।
বৃষ্টির কুয়াশা ঘেরা অট্টালিকা নগর বন্দর
উদাত্ত খিলান স্তম্ভ কারুকার্যে বর্ণাঢ্য বিস্ময়,
অস্থির নিয়তি সে কি মহাকাল নিপুণ স্থপতি ;
সুবর্ণ গ্রন্থিতে যার বাধা পড়ে বহতা সময়।
শুচিস্মিত অন্ধকার অমৃতের দিব্য স্পর্শ খোঁজে :
রোদসী স্মৃতির বৃন্তে পরিশ্রুত প্রগাঢ় প্রত্যয় ;
ঈশ্বর নির্লোভ শান্তি স্বর্গরাজ্য প্রেম সংবেদনা,
সততা সভ্যতা যুদ্ধ ইতিহাস শুদ্ধ রক্তক্ষয়।

সমস্তই শান্ত হোল : অতঃপর অমৃত সন্ধানে,
বিবর্ণ প্রাচীন গ্রন্থি খুলে রেখে যাত্রাবদলের
অন্তিম মুহূর্তে যেন জাতিস্মর বিশ্বের বিস্ময়
মগ্ন হোল : অন্য সূর্য জ্যোতির্ময় আলোর প্রয়াণে।

শান্তনু দাস

সেই গোলাপ প্রেমিককে

১

অনেকদিন, অনেক পথ, ক্লান্ত পায়ে এসে
পান্থরা সব স্বপ্ন নিয়ে স্নিগ্ধ ছায়াতলে,
রঙ মেখেছে সুর সেধেছে কখন সযতনে
গ্রামীণ মেয়ের রক্তগোলাপ, রঙিন উপহার।

২

হঠাৎ কালো ঝড়ে মনের অজান্তে কখন,
বিশাল দেহ হুমড়ী খেয়ে নদীর জলে নামে ঃ
গুমরে ওঠে শিশু, পিতা এবং পিতামহ,
ক্লান্ত দেহে অবনত, মুক্তো ঝরে পড়ে।

৩

এখন অনেক রাত দূরে আকাশ ভরা তারা,
স্তব্ধ বেদী, বিবর্ণ ফুল দেয় বুঝি পাহারা।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাতাত্তর জন্মদিনে

আপাততঃ গোলাপে অনীহা জাগছে
অনীহা ভীষণ।
গুটিকয় বীজ কিনে গোটাটা শহর ঘুরে
পিচগলা রোদে, ধৈর্যের মোম গলে গ্যাছে
তবুও একইঞ্চি জমি কি আশ্চর্য নজরে এলো না-
আলো হাওয়া না হয় ফুসলিয়ে আনা যেত।

আমার সমস্ত রক্তে শয়তানেরা খেলা করছে।
ফোটাতে দেবে না তারা এখন গোলাপ ;
ঐন্দ্রিলা,
তবুও তুমিকি বলবে রক্ত দিয়ে ফোটাতে সে ফুল
না নিয়ে মনুষ্য-প্রতিম কোনো ব্যথার সংলাপ।
অনেক ইচ্ছের রসি জড়িয়ে-জড়িয়ে
রক্ত দিতে গিয়ে
গতকাল ব্লাডব্যাঙ্কে আমার বিবর্ণ রক্ত দূষিত, নাকোচ হয়ে গ্যাছে।
ঐন্দ্রিলা, তোমায় আমি ভালোবাসি…
তা'বলে এ মুহূর্তে ফোটাতে বলো না তুমি ফুল!

অতএব…হে ঈশ্বর শয়তানের মৃত্যু হোক,
টবের মাটিতে আমি কাল থেকে সবজিই বসাবো।
আপাততঃ গোলাপে অনীহা জাগছে
অনীহা ভীষণ ॥



হরিহর দে

একটি নিবেদিত কবিতা

আমার বাগানে ফোটে স্মৃতি কিংবা একটি গোলাপ ;
একটি গোলাপ কিংবা স্মৃতি রোজ আমার বাগানে,
লতা ফুল পাখি লতা—তাহাদের অপার সংলাপ.
প্রত্যুষ, নীলিমা থেকে অনায়াসে মুক্তি চেয়ে আনে

প্রতিদিন ঊষা ভেঙে ঊর্ধ্বমুখী সকালবেলায়
গোলাপের রৌদ্র দেখি—যে-গোলাপ তোমার তোমার
এবং তোমারই বুক্ষে নম্র ভোর মায়া কুয়াশায়
যে গোলাপ কথা বলে, গল্প করে দূর নীলিমার।

সমস্ত গোলাপ তুমি নিতে চাও, নাও।...দাও রেখে
রক্তের স্মৃতির গন্ধ, স্মৃতি—লাল রক্তের মতন।
ওইমাত্র গন্ধ স্মৃতি তোমার সে গোলাপের থেকে
রেখে দেব বক্ষোপাশে, কোটি লক্ষ পুষ্পের ভুবন।

সুনীল হাজরা
দীপ্ত কণ্ঠস্বর

রয়েছে রক্তের দাগ। বুকে যার জ্বলন্ত আগুন,
সে পথিক অন্ধকারে করেছিল পথের সন্ধান
ভেঙ্গে দিয়ে শতাব্দীর সুকঠিন লোহার শৃঙ্খল ;
অসাড় জাতির প্রাণে এনেছিল মুক্তির আস্বাদ।

যদিও জীবন সব বেদনার উৎস-মুখে একা
ফিরে যায়, নির্জনতা কাঁচের শারসিতে মুখ রাখে ;
ট্রেনের কামরার আলো দ্রুত পথ পার হয়ে যায় ;
স্বপ্নভরা দিনগুলো মনে হয় এ্যালবামের ছবি।

পৃথিবীর পথে পথে এখনো জমাট অন্ধকার :
দুর্বিসহ যন্ত্রণার কালরাত্রি হয়নিকো ভোর ;
সামনে রুক্ষ মরুঝড়, ভয়াবহ নিষ্ঠুর সময়
কঠিন লোভের হাত দুর্বিনীত করে রাজ্যপাট।

তবু যেন জ্বলে কোথা অনির্বাণ আশ্বাসের আলো
শুনতে পাই—জওহরলালের সেই দীপ্ত কণ্ঠস্বর।

বরুণ মজুমদার

নেহরুর নামে

এখন আকাশ থেকে কোন তারা ঝরে গেলো বলো,
এখন আকাশে জমে কার নামে বিষাদের মেঘ,
কার নাম ভেসে আসে বাতাসেতে এমন সময় ?
সে শুধু ভারতবর্ষ প্রিয় নেতা নেহরুর নাম !

তোমার স্বপনে গড়া আমার এ স্বাধীন ভারত
প্রচার করেছে বিশ্বে শান্তি তার প্রাণের শপথে।
'নেহরু অমর রহে' দিকে দিকে তাইতো সবাই
সব দ্বিধা ভয় ভুলে ঘোষণা করেছে বার বার।

এ জন্মে জন্মান্তে নয় তারপরে কোন একদিন
রঙীন আশার সূর্য নিভে গেলে পৃথিবীর পরে
সেদিন তোমার নাম, সেদিন তোমার মধু বাণী
জেগে রবে মেঘে মেঘে জেগে রবে তারায় তারায়।

দুঃখের সমুদ্রে তুমি ভয়হীন শান্তির কাণ্ডারী,
নিয়ে গেছো ভারতেরে অমরাবতীর পথ চিনে।
তোমার চরণ চিহ্ন সবখানে আজো দেখা যায়
গোলাপ এনেছি সাথে, এ দীনের লহগো প্রণাম !

গৌতম গুহ

শান্তি : নেহেরু

যমুনা—আকাশ
দুটি—গাঙচিল
নীল নিভৃতের
সঙ্গাত মিল
ডানায় ডানায় পেলে

উদার শান্তি
পাখনায় মেখে
স্বপ্নের এক
আলপনা এঁকে
গাঙচিল ফিরে এলে

প্রেমের মাটিতে
উচিত এ-সব
লঙ্ঘন করে
আত্মার স্তব
বারুদের বীজ বোনা ?

গোল পৃথিবীর
ছোট্ট টেবিল
চৌদিকে বোসো
ভায়ে ভায়ে মিল
অভিযোগ শুনবো না।

মৃণাল বসুচৌধুরী

বিবর্ণ উদ্যান দেখে

কে তুমি অস্থির হাতে ভেঙে দিচ্ছো সমস্ত বিশ্বাস,
সঙ্গোপন ছায়াছবি, কারুকার্যে চিত্রিত দেয়াল
সজ্জিত উদ্যান থেকে তুলে নিচ্ছো রক্তিম গোলাপ
আমাদের ভালোবাসা, নির্বিকার কোন মত্ততায়।

অদৃশ্য তোমার হস্ত সবকিছু ভাঙে চুরমার
পারে না হৃদয় থেকে মুছে দিতে স্মৃতিময় প্রেম,
যেখানে সহস্রদল উদ্যানের নিলীম প্রার্থনা
স্নায়ুতে শিরায় মিশে গোলাপের রঙ হয়ে আছে।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নেহরু

মননের আলো দিয়ে দেখেছ কি রোশনাই চাঁদ
নিয়নের আলো নয়. নয়কো জ্বলন্ত পরীদের ফাঁদ ।
হাজারো মশাল ভীড়ে শান্তির নামাবলী দিপাবলী গায়
সাইন্যাপস্ তন্ত্রীর বিটোফেনে রবার্ট ফ্রস্টের বিরাগী যন্ত্রণা বাজায়

আপেলের দেশ ছেড়ে ঘূর্ণির উড়ুক্কি উড়নিতে কিম্বা পেরাম্বুলেটারে
সে কোন অচিন পাখি এলাহবাদে বুড়ী ছোঁয়, তিনমূর্তির ফোকরে ফোকরে
শান্তি সাম্য মৈত্রীর থ্রি ডাইমেনসনে বকম্ বকম্ বোল তোলে
শান্তি যে পলাতকা, ভয়ে ভয়ে লুকিয়েছে নলচের কোলে
বটমহোলে রক্তের নীলে লাল পোঁচ কালো আল পাকা, নোনতার স্বাদ
সব আলো অন্ধকার, সব ভালো লাগে বিস্বাদ ।

রুদ্রেন্দু সরকার

সাতাশের মে

সেইদিন দুপুরের রোদে ওড়া মন
বাঁশপাতা চিবুতে চিবুতে
থেমেছিল অশথের গোড়ে,
শান্তির পায়রাটা ধুকে ধুকে তখনতো ওড়ে !

মেহেদি লাগিয়ে রেখে তুলছিল ছাপ
সরু মাজা আধোরাঙা পশ্চিমী বউ,
কি জানি হঠাৎ কোন ওড়া বাজ দেখে,
পায়রাটা হয়েছে উধাও।
পোড়া মন টনটনে কেন উড়ো লাগে
কিছু নাকি হয়েছেই তবে ?
কেঁদোমেয়ে হাই তুলে প্রশ্ন করে
বেতার তরঙ্গ বলে নেই……

বিল পুড়ে খাঁ খাঁ করে সাতাশের মে—
শহরের ছেলেটার মাথাটাই ঘোরে,
ইতিহাস ইতিহাস ইতিহাস হবে
হামাগুড়ে শিশুটার মুখে লাল ঝরে।

প্রেমিক সঙ্গোপণে, দিয়েছিল ঠাঁই
বোতামের ফাঁকা ধরে ফুল কুঁড়িটাই,
বুঝি আর নাই বুঝি হয় বড় সাধ
নাইট্রিক ঢেলে দিয়ে বার করি খাদ।
চুনো পুঁটি তড়পায় এক হাঁটু জলে,
ওরা খাবি খায় খেতে, ফারনেসে জ্বলে।